আল ওয়াকি'আ

৫৬

নামকরণ

সূরার সর্বপ্রথম আয়াতে اَلْوَاقِعَةُ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূরাসমূহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল ওয়াকি'আ এবং তারও পরে আশ শু'আরা (الاتقان للسيوطى)। ইকরিমাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন (بيهقى دلائل النبوة)।

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাহিনীতে বলা হয়েছে হযরত উমর (রা) যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত করা হচ্ছিলো। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সবাই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর (রা) প্রথমেই ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল। বোনের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে দেখে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহীফা লুকিয়েছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। তাঁর বোন বললেন, শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র وانه لايمسها الا الطاهر "কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহীফা হাতে নিতে পারে।" একথা শুনে হযরত উমর (রা) গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহীফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি'আ নাযিল হয়েছিল। কারণ ঐ সূরার মধ্যেই لَايَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা) হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিবাদ। এক দিন যে কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তারপর সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে

তাদের হিসেব–নিকেশ নেয়া হবে এবং সৎকর্মশীল মানুষদেরকে জান্নাতের বাগানসমূহে রাখা হবে আর গোনাহগারদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে—এসব কথাকে তারা সর্বাধিক অবিশ্বাস্য বলে মনে করতো। তারা বলতো ঃ এসব কল্পনা মাত্র। এসব বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এ ঘটনা প্রকৃতই যখন সংঘটিত হবে তখন এসব মিথ্যা কথকদের কেউ–ই বলবে না যে, তা সংঘটিত হয়নি তার আগমন রুখে দেয়ার কিংবা তার বাস্তবতাকে অবাস্তব বানিয়ে দেয়ার সাধ্যও কারো হবে না। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যরূপে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, সাবেকীন বা অগ্রগামীদের শ্রেণী। দুই, সালেহীন বা সাধারণ নেক্‌কারদের শ্রেণী। এবং তিন, সেই সব মানুষ যারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো এবং আমৃত্যু কুফরী, শিরক ও কবীরা গোনাহর ওপর অবিচল ছিল। এ তিনটি শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হবে ৭ থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর ৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাত ইসলামের এ দু'টি মৌলিক আকীদার সত্যতা সম্পর্কে পর পর যুক্তি–প্রমান পেশ করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয়কেই কাফেররা অস্বীকার করে আসছিলো। এ ক্ষেত্রে যুক্তি–প্রমাণ হিসেবে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মানুষকে তার নিজের সত্তার প্রতি যে খাবার সে খায় সে খাবারের প্রতি, যে পানি সে পান করে সে পানির প্রতি এবং যে আগুনের সাহায্যে সে নিজের খাবার তৈরী করে সে আগুনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে এ প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টি করার কারণে তুমি সৃষ্টি হয়েছো যার দেয়া জীবন যাপনের সামগ্রীতে তুমি প্রতিপালিত হচ্ছো, তাঁর মোকাবিলায় তুমি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করার কি অধিকার তোমার আছে? তাঁর সম্পর্কে তুমি এ ধারণা করে বসলে কি করে যে, তিনি একবার তোমাকে অস্তিত্ব দান করার পর এমন অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দান করতে চাইলেও তা পারবেন না?

তারপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে তাদের নানা রকম সন্দেহ–সংশয় নিরসন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে যে, হতভাগারা তোমাদের কাছে এ তো এক বিরাট নিয়ামত এসেছে। অথচ এ নিয়ামতের সাথে তোমাদের আচরণ হলো, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করছো না। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অনুপম যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কুরআন নিয়ে কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখে তাহলে তার মধ্যেও ঠিক তেমনি মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে যেমন মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে মহাবিশ্বের তারকা ও গ্রহরাজির মধ্যে। আর এসব একথাই প্রমাণ করে যে, যিনি এই মহাবিশ্বের নিয়ম–শৃংখলা ও বিধান সৃষ্টি করেছেন কুরআনের রচয়িতাও তিনিই। তারপর কাফেরদের বলা হয়েছে, এ গ্রন্থ সেই ভাগ্যলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যা সমস্ত সৃষ্টির নাগালের বাইরে। তোমরা মনে করো শয়তান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ গ্রন্থের কথাগুলো নিয়ে আসে। অথচ 'লাওহে মাহফুজ' থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌছায় তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতারা ছাড়া আর কারো সামান্যতম হাতও থাকে না।

সর্বশেষে মানুষকে বলা হয়েছে, তুমি যতই গর্ব ও অহংকার করো না কেন এবং নিজের স্বেচ্ছাচারিতার অহমিকায় বাস্তব সম্পর্কে যতই অন্ধ হয়ে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তটি তোমার চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে সময় তুমি একান্তই অসহায় হয়ে পড়ো। নিজের পিতা–মাতাকে বাঁচাতে পার না। নিজের সন্তান–সন্ততিকে বাঁচাতে পার না। নিজের পীর ও মুর্শিদ এবং অতি প্রিয় নেতাদেরকে বাঁচাতে পার না। সবাই তোমার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর তুমি অসহায়ের মত দেখতে থাক। তোমার ওপরে যদি কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ও শাসক না–ই থেকে থাকে এবং পৃথিবীতে কেবল তুমিই থেকে থাক, কোন আল্লাহ না থেকে থাকে, তোমার এ ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পার না কেন? এ ব্যাপারে তুমি যেমন অসহায় ঠিক তেমনি আল্লাহর সামনে জবাবদিহি এবং তার প্রতিদান ও শাস্তি প্রতিহত করাও তোমার সাধ্যের বাইরে। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে তার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে। "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীদের অন্তরভূক্ত হলে 'মুকাররাবীনদের' পরিণাম ভোগ করবে। 'সালেহীন' বা সৎকর্মশীল হলে সালেহীনদের পরিণাম ভোগ করবে এবং অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হলে সেই পরিণাম লাভ করবে যা এ ধরনের পাপীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ④ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ⑥ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑦ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑧ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑨

যখন সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তার সংঘটিত হওয়াকে কেউ–ই মিথ্যা বলতে পারবে না।[১] *তা হবে উলট–পালটকারী মহা প্রলয়।*[২] *পৃথিবীকে সে সময় অকস্মাত ভীষণভাবে আলোড়িত করা হবে*[৩] *এবং পাহাড়কে এমন টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।*

সে সময় তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[৪]

ডান দিকের লোক।[৫] *ডান দিকের লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কতটা বলা যাবে।*

বাম দিকের লোক[৬] *বাম দিকের লোকদের (দুর্ভাগ্যের) পরিণতি আর কি বলা যাবে।*

১. এ আয়াতাংশ দ্বারা বক্তব্য শুরু করা স্বতসিদ্ধভাবেই প্রমাণ করে যে, সে সময় কাফেরদের মজলিস–সমূহে কিয়ামতের বিরুদ্ধে যেসব কাহিনী ফাঁদা হতো এবং গালগপ্প করা হতো, এটা তার জবাব। যখন মক্কার লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে সবেমাত্র ইসলামের দাওয়াত শুনছে এটা ঠিক সে সময়ের কথা। এর মধ্যে তাদের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে হতো তা হচ্ছে, এক দিন আসমান যমীনের এ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারপর অন্য একটি জগত সৃষ্টি হবে যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। একথা শুনে তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেতো। তারা বলতো ঃ এটা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে এ পৃথিবী, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র এবং সূর্য কোথায় যাবে। শত শত হাজার হাজার বছরের কবরস্থ মৃতরা কিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে? মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনলাভ, তারপর সেখানে থাকবে বেহেশতের বাগান ও

দোযখের আগুন এসব স্বপ্নচারিতা ও আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। বুদ্ধিবিবেক ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমরা এসব কি করে মেনে নিতে পারি? মক্কার সর্বত্র তখন এই গালগল্পকে কেন্দ্র করে আসর জমছিলো। এ পটভূমিতে বলা হয়েছে, যখন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তা অস্বীকার করার মত কেউ থাকবে না।

এ বাণীর মধ্যে কিয়ামত বুঝাতে وَاقِعَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ যা অনিবার্য ও অবধারিত। অর্থাৎ তা এমন জিনিস যা অনিবার্যরূপেই সংঘটিত হতে হবে। এর সংঘটিত হওয়াকে আবার وَقْعَة শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি আকস্মিকভাবে কোন বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়া, আগমন থেমে যাওয়া কিংবা এর আগমন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অন্য কথায়, এ বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব ও অস্তিত্বহীন বানিয়ে দেয়ার মত কেউ থাকবে না। দুই, কোন জীবন্ত সত্তাই তখন এ মিথ্যা কথা বলবে না যে, এ ঘটনা আদৌ সংঘটিত হয়নি।

২. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ "নীচুকারী ও উঁচুকারী" এর একটি অর্থ হতে পারে সেই মহা ঘটনা সব কিছু উলট-পালট করে দেবে। নীচের জিনিস উপরে উঠে যাবে এবং উপরের জিনিস নীচে নেমে যাবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তা নীচে পতিত মানুষদেরকে উপরে উঠিয়ে দেবে এবং উপরের মানুষদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে। অর্থাৎ তা আসার পর মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও অমার্যাদার ফায়সালা হবে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে অতি সম্মানিত বলে দাবী করে বেড়াতো তারা লাঞ্ছিত হবে আর যাদের নীচ ও হীন মনে করা হতো তারা মর্যাদা লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ তা কোন আঞ্চলিক সীমিত মাত্রার ভূমিকম্প হবে না। বরং যুগপৎ সমগ্র পৃথিবীকে গভীর আলোড়নে প্রকম্পিত করবে। পৃথিবী হঠাৎ করে এমন বিরাট ঝাঁকুনি খাবে যার ফলে তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

৪. যাদেরকে এ বক্তব্য শুনানো হচ্ছিলো কিংবা এখন যারা তা পড়বে বা শুনবে, বাহ্যত কেবল তাদেরকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তারা সবাই কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হবে।

৫. মূল আয়াতে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে مَيْمَنَة শব্দটি يَمِين শব্দ থেকে গৃহিত হতে পারে—যার অর্থ ডান হাত। আবার يُمْن শব্দ থেকেও গৃহিত হতে পারে যার অর্থ শুভ লক্ষণ। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ শব্দটির উৎপত্তি يَمِين শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এর অর্থ হবে "ডান হাতের অধিকারী।" কিন্তু এখানে এর আভিধানিক অর্থ অভিপ্রেত নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক ডান হাতকে আরবের লোকেরা শক্তি, মহত্ব ও মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করতো। যাকে মর্যাদা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হতো মজলিসের মধ্যে তাকে ডান হাতের দিকে বসাতো। আমার কাছে অমুক ব্যক্তির অনেক সম্মান ও মর্যাদা একথা বুঝানোর প্রয়োজন হলে বলতো ঃ فُلَانٌ مِنِّي بِالْيَمِيْنِ সে তো আমার

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।[৭] তারাই তো নৈকট্য লাভকারী। তারা নিয়ামতে ভরা জান্নাতে থাকবে। পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে বেশী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে কম।[৮] তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসবে। তাদের মজলিসে চির কিশোররা[৯] বহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান পাত্র, হাতল বিশিষ্ট সুরা পাত্র এবং হাতলবিহীন বড় সুরা পাত্র নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকবে—যা পান করে মাথা ঘুরবে না কিংবা বুদ্ধিবিবেক লোপ পাবে না।[১০] তারা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে যাতে পছন্দ মত বেছে নিতে পারে। পাখীর গোশত পরিবেশন করবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে।[১১]

ডান হাতের পাশে। আমাদের ভাষাতেও কাউকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 'দক্ষিণ হস্ত' বলার অর্থ সে তার ঘনিষ্ঠ জন। আর যদি ধরে নেয়া যায় যে, এর উৎপত্তি يمن শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে اصحاب الميمنة এর অর্থ হবে 'খোশ নসীব' ও সৌভাগ্যবান।

৬. মূল ইবারতে " اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ " শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مشئمة শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شئوم থেকে। এর অর্থ, দুর্ভাগ্য, কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ। আরবী ভাষায় বাঁ হাতকেও شومى বলা হয়। আরবরা شمال (বাঁ হাত) এবং شوم অশুভ লক্ষণ, শব্দ দু'টিকে সমার্থক বলে মনে করতো। তাদের কাছে বাঁ হাত দুর্বলতা ও লাঞ্ছনার প্রতীক। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি পাখী তাদের বাঁ হাতের দিক দিয়ে উড়ে যেতো তাহলে তারা একে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো। কাউকে বাঁ পাশে বসালে তার অর্থ হতো সে তাকে নীচু মর্যাদার লোক মনে করে। আমার কাছে তার কোন মর্যাদা নেই কারো সম্পর্কে যদি একথা বলতে হয় তাহলে বলা হয় فلان منى بالشمال সে আমার বাঁ পাশের লোক। বাংলা ভাষাতেও খুব হালকা ও সহজ কাজ বুঝাতে বলা হয়, এটা আমার বাঁ হাতের খেলা। অতএব اصحاب المشئمة অর্থ দুর্ভাগা লোক অথবা এমন লোক যারা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে বাঁ দিকে দাঁড় করানো।

৭. سـابـقـيـن (অগ্রগামীগণ) অর্থ যারা সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণতায় সবাইকে অতিক্রম করেছে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সবার আগে থেকেছে। আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সবার আগে সাড়া দিয়েছে, জিহাদের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে হোক কিংবা জনসেবার কাজ হোক কিংবা কল্যাণের পথে দাওয়াত কিংবা সত্যের পথে দাওয়াতের কাজ হোক মোট কথা পৃথিবীতে কল্যাণের প্রসার এবং অকল্যাণের উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং শ্রমদান জীবনপনের যে সুযোগই এসেছে তাতে সে–ই অগ্রগামী হয়ে কাজ করেছে। এ কারণে আখেরাতেও তাদেরকেই সবার আগে রাখা হবে। অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারের চিত্র হবে এই যে, ডানে থাকবে 'সালেহীন' বা (নেককারগণ, বাঁয়ে থাকবে ফাসেক বা পাপীরা এবং সবার আগে আল্লাহ তা'আলার দরবারের নিকটে থাকবেন 'সাবেকীন'গণ। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের জিজ্ঞেস করলেন? তোমরা কি জান কিয়ামতের দিন কারা সর্বপ্রথম পৌঁছবে এবং আল্লাহর ছায়ায় স্থান লাভ করবে? সবাই বললেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ

الذين اذا اعطو الحق قبلوه ، واذا سئلوه بذلوه ، وحكموا الناس كحكمهم لانفسهم –

"যাদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের সামনে যখনই সত্য পেশ করা হয়েছে, তা গ্রহণ করেছে। যখনই তাদের কাছে প্রাপ্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তা দিয়ে দিয়েছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছে অন্যদের ব্যাপারেও সেই ফায়সালা করেছে। "(মুসনাদে আহমদ)।"

৮. 'আওয়ালীন' ও আখেরীন' অর্থাৎ অগ্রবর্তী ও পরবর্তী বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এক দলের মতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত যত উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা 'আওয়ালীন' আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটবে তারা সবাই আখেরীন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী হাজার হাজার বছরে যত মানুষ চলে গিয়েছে তাদের মধ্য থেকে 'সাবেকীন'দের সংখ্যা বেশী হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্যে যারা 'সাবেকীন'দের মর্যাদা লাভ করবে তাদের সংখ্যা হবে কম। দ্বিতীয় দল বলেন, এখানে 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন' অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আওয়ালীন'। তাদের মধ্যে 'সাবেকীনদের সংখ্যা হবে বেশী। পরবর্তী যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আখেরীন'। তাদের মধ্যে সাবেকীনদের সংখ্যা হবে কম। তৃতীয় দল বলেন ঃ এর অর্থ প্রত্যেক নবীর উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর প্রাথমিক যুগের অনুসারীদের মধ্যে আওয়ালীনদের সংখ্যা বেশী হবে এবং পরবর্তীকালের অনুসারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। আয়াতের শব্দাবলী এ তিনটি অর্থই ধারণ করছে। এখানে

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ
الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿٢٩﴾
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ
وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ
أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

তাদের জন্য থাকবে সুনয়না হুর এমন অনুপম সুন্দরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।[১২] দুনিয়াতে তারা যেসব কাজ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে এসব লাভ করবে। সেখানে তারা কোন অর্থহীন বা গোনাহর কথা শুনতে পাবে না।[১৩] বরং যে কথাই শুনবে তা হবে যথাযথ ও ঠিকঠাক।[১৪]

আর ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কতটা বলা যাবে। তারা কাঁটাহীন কুল গাছের কুল,[১৫] থরে বিথরে সজ্জিত কলা, দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া, সদা বহমান পানি, অবাধ লভ্য অনিশেষ যোগ্য প্রচুর ফলমূল[১৬] এবং সুউচ্চ আসনসমূহে অবস্থান করবে। তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেব।[১৭] তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত[১৮] ও তাদের সমবয়স্কা।[১৯] এসব হবে ডান দিকের লোকদের জন্য।

এ তিনটি অর্থই প্রযোজ্য হওয়াটা বিচিত্র নয়। কারণ, প্রকৃত পক্ষে এসব অর্থের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এছাড়াও এসব শব্দ থেকে আরো একটি অর্থ পাওয়া যায়। সেটিও নির্ভুল অর্থ। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাথমিক যুগে মানব গোষ্ঠীর মধ্যে 'সাবেকীন'দের অনুপাত থাকবে বেশী এবং পরবর্তী যুগে সে অনুপাত থাকবে কম। তাই মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় নেক কাজে অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা সে গতিতে বৃদ্ধি পায় না। গণনার দিক দিয়ে তাদের সংখ্যা প্রথম যুগের সাবেকীনদের চেয়ে অধিক হলেও পৃথিবীর সমস্ত জনবসতির বিচারে তাদের অনুপাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

৯. অর্থাৎ এমন সব বালক যারা চিরদিনই বালক থাকবে। তাদের বয়স সব সময় একই অবস্থায় থেমে থাকবে। হযরত আলী (রা) ও হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ এরা দুনিয়ার মানুষের সেসব শিশু সন্তান যারা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ

করেছিলো। সুতরাং তাদের এমন কোন নেকী থাকবে না যার প্রতিদান দেয়া যেতে পারে এবং এমন কোন বদ কাজও থাকবে না যার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, তারা হবে পৃথিবীর এমন লোকদের সন্তান যাদের ভাগ্যে জান্নাত জোটেনি। অন্যথায় নেক্কার মু'মিনদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। (আত্ তূর, আয়াত ২১) আবু দাউদ তায়ালেসী, তাবারানী ও বায্যার কর্তৃক হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর, টীকা ২৬, আত তূর, টীকা ১৯)।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর। টীকা ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২২, আত তূর, টীকা ১৮।

১১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর এর তাফসীর, টীকা ১৭।

১২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাতের তাফসীর, টীকা ২৮ ও ২৯ আদ দুখান, টীকা ৪২, আর রাহমান, টীকা ৫১।

১৩. এটি জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের একটি। এসব নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের কান সেখানে কোন অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগপ্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা শোনা থেকে রক্ষা পাবে। সেটা কটুভাষী ও অভদ্র লোকদের সমাজ হবে না যে, পরস্পরে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করবে। সেটা হবে সভ্য ও ভদ্র লোকদের সমাজ যেখানে এসব অর্থহীন ও বেহুদা কথাবার্তার নামগন্ধ পর্যন্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে যদি সামান্য কিছু শিষ্টতা বোধ ও সুরুচির অধিকারী করে থাকেন তাহলে তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে পার্থিব জীবনে এটা কত বড় কষ্টদায়ক ব্যাপার। জান্নাতে মানুষকে এ থেকে মুক্তির আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

১৪. মূল আয়াতটি হচ্ছে إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا কিছুসংখ্যক মুফাসসির ও অনুবাদক এর অর্থ করেছেন সেখানে সব দিক থেকেই কেবল 'সালাম' 'সালাম' শব্দ শুনা যাবে। কিন্তু এর সঠিক অর্থ হচ্ছে সঠিক, সুস্থ ও যথাযথ কথা। অর্থাৎ এমন কথাবার্তা যা দোষ-ত্রুটি মুক্ত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত মন্দ দিকগুলো নেই। ইংরেজীতে Safe শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত এখানে সালাম শব্দটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষের কুল। কেউ এ কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন যে, কুল আবার এমন কি উৎকৃষ্ট ফল যা জান্নাতে থাকবে বলে সুখবর দেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, জান্নাতের কুল নয়, এ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এ ফলটি এমন সুস্বাদু, খোশবুদার ও মিষ্টি হয় যে, একবার মুখে দিলে রেখে দেয়া কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া কুল যত উন্নতমানের হবে তার গাছ তত কম কাঁটাযুক্ত হবে। তাই

জান্নাতের কুল বৃক্ষের পরিচয় দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তাতে মোটেই কাঁটা থাকবে না। অর্থাৎ তা হবে এমন উন্নত জাতের কুল যা এই পৃথিবীতে নেই।

১৬. মূল আয়াত হচ্ছে لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ । لَامَقْطُوْعَةٍ অর্থ তা কোন মওসুমী ফল হবে না যে, মওসুম শেষ হওয়ার পর আর পাওয়া যাবে না। তার উৎপাদন কোন সময় বন্ধ হবে না যে, কোন বাগানের সমস্ত ফল সংগ্রহ করে নেয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাগান ফলশূন্য থাকবে। বরং যতই খাওয়া হোক না কেন সেখানে প্রতিটি মওসুমে প্রতিটি ফল পাওয়া যাবে এবং লাগাতার উৎপন্ন হতে থাকবে। আর لَا مَمْنُوْعَةٍ অর্থ দুনিয়ার ফল বাগানসমূহের মত সেখানে কোন বাধা বিঘ্ন থাকবে না। ফল আহরণ ও খাওয়ার ব্যাপারে যেমন কোন বাধা থাকবে না তেমনি গাছে কাঁটা না থাকা এবং ফল অধিক উচ্চতায় না থাকার কারণে আহরণ করতেও কোন কষ্ট হবে না।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার সেসব সৎকর্মশীলা নারী যারা তাদের ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে জান্নাত লাভ করবে। পৃথিবীতে তারা যত বৃদ্ধাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করুক না কেন সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে যুবতী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা সুন্দরী থাক বা না থাক সেখানে আল্লাহ তাদের পরমা সুন্দরী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে বা সন্তানবতী হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকুক, আল্লাহ তাদের কুমারী বানিয়ে দেবেন। তাদের সাথে তাদের স্বামীরাও যদি জান্নাত লাভ করে থাকে তাহলে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন। এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা কতিপয় হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক বৃদ্ধা নবীর (সা) কাছে এসে বললো ঃ আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি সেজন্য দোয়া করুন। নবী (সা) বললেন ঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে থাকলে তিনি উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ তাকে বলে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেবো।" ইবনে আবী হাতেম হযরত সালামা ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এর দ্বারা পৃথিবীর মেয়েদের বুঝানো হয়েছে—তারা কুমারী বা বিবাহিতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। তাবারানীতে হযরত উম্মে সালামা থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি নবীর (সা) কাছে জান্নাতের মেয়েদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের আয়াতসমূহের অর্থ জিজ্ঞেস করছেন। এক্ষেত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী (সা) বলেন ঃ

هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى –

"এরা সেসব মেয়ে যারা দুনিয়ার জীবনে খুন খুনে বুড়ী, পিচুটি গলা চোখ ও পাকা সাদা চুল নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এ বার্ধক্যের পরে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে কুমারী বানিয়ে সৃষ্টি করবেন।"

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

২ রুকূ'

তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক।

বাঁ দিকের লোক। বাঁ দিকের লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলা যাবে। তারা লু হাওয়ার হলকা, ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার নীচে থাকবে। তা না হবে ঠাণ্ডা, না হবে আরামদায়ক। এরা সেসব লোক যারা এ পরিণতিলাভের পূর্বে সুখী ছিল এবং বারবার বড় বড় গোনাহ করতো।[২০]

হযরত উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবীতে কোন মেয়ের যদি একাধিক স্বামী থেকে থাকে তাহলে কে তাকে লাভ করবে? নবী (সা) বলেন ঃ

انها تخير فتختارا حسنهم خلقا فتقول يارب ان هذا كان احسن خلقا معى فزوجنيها - يا ام سلمة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة -

"তাকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে। যার আখলাক ও আচরণ সবার চেয়ে ভাল ছিলো সে তাকেই বেছে নেবে। সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে ঃ "হে আমার রব, আমার সাথে তার আচরণ ছিলো সবচেয়ে ভাল। অতএব আমাকে তার স্ত্রী বানিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা, উত্তম আচরণ দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ অর্জন করলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমানের তাফসীর, টীকা ৫১)।

১৮. মূল আয়াতে عُرُبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কমনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধ, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী।

১৯. এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

বলতো ঃ আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং নিরেট হাড্ডি অবশিষ্ট থাকবো তখন কি আমাদেরকে জীবিত করে তোলা হবে? আমাদের বাপ দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে? হে নবী, এদের বলে দাও, নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সব মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। সে জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা তোমাদেরকে 'যাক্কূম'[২১] বৃক্ষজাত খাদ্য খেতে হবে। তোমরা ঐ খাদ্য দিয়েই পেট পূর্ণ করবে এবং তার পরই পিপাসার্ত উটের মত ফুটন্ত পানি পান করবে। প্রতিদান দিবসে বাঁ দিকের লোকদের আপ্যায়নের উপকরণ।

আমি তোমাদের[২২] সৃষ্টি করেছি। এরপরও কেন তোমরা মানছো না?[২৩] তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে শুক্র তোমরা নিক্ষেপ করো তা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি তোমরা করো, না তার স্রষ্টা আমি?[২৪]

বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থাকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابناء ثلاث وثلاثين –

"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোন পশম থাকবে না। মোচ ভেজা ভেজা মনে হবে। কিন্তু দাড়ি থাকবে না। ফর্সা শ্বেত বর্ণ হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স ৩৩ বছর হবে" (মুসনাদে আহমদ, আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীস)।

২০. অর্থাৎ তাদের ওপর সুখ-স্বাচ্ছন্দের উল্টা প্রভাব পড়েছিলো। আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা তাঁর নিয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলো। নিজেদের প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে নিমগ্ন হয়ে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো এবং একের পর এক বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছিলো। বড় গোনাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক। এর দ্বারা যেমন কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা বড় গোনাহ বুঝানো হয়েছে তেমনি নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে বড় গোনাহও বুঝানো হয়েছে।

২১. যাক্‌কূমের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা সাফ্‌ফাতের তাফসীর, টীকা-৩৪।

২২. এখান থেকে ৭৪ আয়াতে যে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাতে একই সাথে আখেরাত ও তাওহীদ উভয় বিষয়েই যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মক্কার মানুষেরা যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার এ দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতিবাদ করছিলো তাই এখানে এমনভাবে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে যা দ্বারা আখেরাত প্রমাণিত হয় এবং তাওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. অর্থাৎ আমিই যে তোমাদের রব ও উপাস্য এবং আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি এ কথা মেনে নেয়া।

২৪. ছোট্ট এ বাক্যে মানুষের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য সব জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধু এই একটি বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতো যে, সে নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে কুরআনের একত্ববাদী শিক্ষায়ও তার কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না, তার আখেরাত সম্পর্কিত শিক্ষায়ও কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না। মানুষের জন্ম পদ্ধতি তো এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পুরুষ তার শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে পৌছে দেয় মাত্র। কিন্তু ঐ শুক্রের মধ্যে কি সন্তান সৃষ্টি করার এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের সন্তান সৃষ্টি করার যোগ্যতা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে? কিংবা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? অথবা এই শুক্র দ্বারা গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করে দেয়া কি কোন পুরুষ অথবা কোন নারী কিংবা দুনিয়ার কোন শক্তির ইখতিয়ারে? তারপর গর্ভের সূচনা থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত মায়ের পেটে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি ও লালন করা এবং প্রতিটি শিশুকে স্বতন্ত্র আকৃতি দান করা, প্রতিটি শিশুর মধ্যে একটি বিশেষ অনুপাতে মানসিক ও দৈহিক শক্তি দান করা যার সাহায্যে সে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে—এটা কি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাজ? এতে কি আর কারো সামান্যতম দখলও আছে? পিতা-মাতা নিজে কি একাজ করে থাকে? না কোন ডাক্তার এ কাজ করে? নাকি নবী-রসূল ও আওলিয়াগণ এ কাজ করে থাকেন—যারা এই একই পন্থায় জন্মলাভ করেছেন? না কি সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি এ কাজ করে থাকে—যারা নিজেরাই একটি নিয়ম-নীতির নিগড়ে বাঁধা? নাকি সেই প্রকৃতি (Nature) একাজ করে যা নিজে কোন

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ
أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে বন্টন করেছি।[২৫] *তোমাদের আকার আকৃতি পাল্টে দিতে এবং তোমাদের অজানা কোন আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম নই।*[২৬] *নিজেদের প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা জান। তবুও কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনা।*[২৭]

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে বীজ তোমরা বপন করে থাকো তা থেকে ফসল উৎপন্ন তোমরা করো, না আমি?[২৮] *আমি চাইলে এসব ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারি। তখন তোমরা নানা রকমের কথা বলতে থাকবে। বলবে আমাদেরকে তো উল্টা জরিমানা দিতে হলো। আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ।*

জ্ঞান কলাকৌশল, ইচ্ছা ও ইখতিয়ার রাখে না? তাছাড়া সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে, সুশ্রী হবে না কদাকার, শক্তিশালী হবে না দুর্বল, অন্ধ, কালা, খোঁড়া ও প্রতিবন্ধী হবে, না সুস্থ অংগ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এবং মেধাবী হবে, না মেধাহীন—সে সিদ্ধান্ত কি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে? তাছাড়া জাতিসমূহের ইতিহাসে কখন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন ভাল বা মন্দ গুণের অধিকারী লোক সৃষ্টি করতে হবে যারা সে জাতিকে উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিয়ে দেবে কিংবা অধপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে? কেউ যদি এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতায় লিপ্ত না হয় তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, শিরক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত জওয়াব দেয়া সম্ভব নয়। এর যুক্তি সংগত জওয়াব একটিই। তা হচ্ছে, মানুষ পুরোপুরি আল্লাহর সৃষ্টি। আর প্রকৃত সত্য যখন এই তখন আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষের তার আল্লাহর মোকাবেলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার দাবী করার কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার কি অধিকার আছে?

তাওহীদের মত আখেরাতের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। এমন একটি ক্ষুদ্র কীট থেকে মানুষের জন্মের সূচনা হয় যা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায়

না। এক সময় এই কীট নারী দেহের গভীর অন্ধকারে নারীর ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় ঐ ডিম্বানুও আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত নয়। এ দু'য়ের সংযুক্তি দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষ (cell) সৃষ্টি হয়। এটিই মানব জীবনের সূচনা বিন্দু। এ কোষটিও এত ক্ষুদ্র হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা দেখা যায় না। মাতৃগর্ভে অতি ক্ষুদ্র এ কোষের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা ৯ মাসের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে তাকে একটি পূর্ণ মানুষে রূপ দান করেন। তার গঠন ও নির্মাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে হৈ চৈ করে দুনিয়া মাতিয়া তোলার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মায়ের দেহই তাকে ঠেলে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ এভাবেই পৃথিবীতে এসেছে এবং তাদের মত মানুষের জন্ম গ্রহণের এ দৃশ্যই রাত দিন দেখছে। তা সত্ত্বেও কোন বিবেকহীন ব্যক্তিই শুধু বলতে পারে, যে আল্লাহ বর্তমানে এভাবে মানুষকে সৃষ্টি করছেন তিনি তাঁর সৃষ্ট এসব মানুষকে পুনরায় অন্য কোন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমার ইখতিয়ারে। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমার ইখতিয়ারে। কে মাতৃগর্ভে মারা যাবে, কে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাবে এবং কে কোন্ বয়সে উপনীত হয়ে মারা যাবে সে সিদ্ধান্ত আমিই নিয়ে থাকি। যার মৃত্যুর জন্য আমি যে সময় ঠিক করে দিয়েছি তার পূর্বে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে মারতে পারে না এবং সে সময়ের পর কেউ তাকে এক মুহূর্ত জীবিত রাখতেও পারে না। যাদের মৃত্যুর সময় হাজির হয় তারা বড় বড় হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি ডাক্তার নিজেও তার মৃত্যুর সময় মরে যায়। কেউ কখনো মৃত্যুর সময় জানতে পারেনি, ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, কার মৃত্যু কিসের মাধ্যমে কখন কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে তাও কেউ জানে না।

২৬. অর্থাৎ বর্তমান আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে আমি যেমন অক্ষম হই নাই। তেমনি তোমাদের সৃষ্টি পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য আকার-আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট দিয়ে তোমাদের সৃষ্টি করতেও আমি অক্ষম নই। বর্তমানে আমি তোমাদের সৃষ্টি করি এভাবে যে, তোমাদের শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে স্থিতি লাভ করে এবং সেখানে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি লাভ করে একটি শিশুর আকারে তা বেরিয়ে আসে। সৃষ্টির এই পদ্ধতিও আমার নির্ধারিত। সৃষ্টির ধরাবাঁধা এই একটা নিয়মই শুধু আমার কাছে নেই যে, এটি ছাড়া অন্য কোন নিয়ম-পদ্ধতি আমি জানি না বা কার্যকরী করতে পারি না। যে বয়সে তোমাদের মৃত্যু হয়েছিল কিয়ামতের দিন ঠিক সেই বয়সের মানুষের আকৃতি দিয়েই আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি। বর্তমানে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এক রকমের পরিমাপ রেখেছি। কিন্তু আমার কাছে মানুষের জন্য এই একটি মাত্র পরিমাপই নেই যে, আমি তা পরিবর্তন করতে পারি না। আমি কিয়ামতের দিন তা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কিছু করে দেব। ফলে তোমরা এখানে যা দেখতে ও শুনতে পাও না তা দেখতে ও শুনতে পাবে। এখন তোমাদের শরীরের চামড়া, তোমাদের হাত পা এবং তোমাদের চোখের কোন বাক শক্তি নেই। কিন্তু মুখকে বলার শক্তি তো আমিই দিয়েছি। কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তোমাদের গাত্র চর্মের প্রতিটি অংশ আমার আদেশে কথা বলবে। এ ব্যবস্থা করতে আমি অক্ষম নই। বর্তমানে তোমরা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাক এবং তারপর মৃত্যুবরণ কর।

তোমাদের এ জীবন মৃত্যুও আমার নির্ধারিত একটি বিধানের অধীনে হয়ে থাকে। তোমাদের জীবনের জন্য ভবিষ্যতে আমি অন্য আরেকটি বিধান বানাতে সক্ষম যার অধীনে তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। বর্তমানে তোমরা একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত আযাব সহ্য করতে পার। তার চেয়ে অধিক আযাব দেয়া হলে তোমরা জীবিত থাকতে পার না। এ নিয়ম বিধানও আমারই তৈরী। ভবিষ্যতে আমি তোমাদের জন্য আর একটি আইন-বিধান তৈরী করতে পারি যার অধীনে তোমরা এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরকম আযাব ভোগ করতে সক্ষম হবে যে, তার কল্পনাও তোমরা করতে পার না। কঠোর থেকে কঠোরতর আযাব ভোগ করেও তোমাদের মৃত্যু হবে না। আজ তোমরা ভাবতেও পার না যে, কোন বৃদ্ধ যুবক হয়ে যেতে পারে, কেউ রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে কিংবা কেউ মোটেই বার্ধক্যে উপনীত হবে না এবং চিরদিন একই বয়সের যুবক থাকবে। কিন্তু এখানে যৌবনের পরে বার্ধক্য আসে আমার দেয়া নিয়ম বিধান অনুসারেই। ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনের জন্য আমি এমন ভিন্ন নিয়ম-বিধান বানাতে সক্ষম, যার আওতায় জান্নাতে প্রবেশ মাত্র প্রত্যেক বৃদ্ধ যুবকে পরিণত হবে এবং তার যৌবন ও সুস্থতা অটুট ও অবিনশ্বর হবে।

২৭. অর্থাৎ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তোমরা অবশ্যই জান। যে শুক্র দ্বারা তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে তা পিতার মেরুদণ্ড থেকে কিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, মায়ের গর্ভাশয় যা কবরের অন্ধকার থেকে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না তার মধ্যে কিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়ে জীবিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কিভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সদৃশ কোষের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে এই মন-মগজ, এই চোখ কান ও এই হাত পা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিল্প জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্ত করে নেয়ার মত বিস্ময়কর যোগ্যতাসমূহ দান করা হয়েছে। এটা কি মৃতদের জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক ও কম বিস্ময়কর? এসব বিস্ময়কর ব্যাপার তোমরা যখন নিজের চোখেই দেখছো এবং নিজেরাই তার জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে বর্তমান আছ, তখন তা থেকে এ শিক্ষা কেন গ্রহণ করছো না যে, আল্লাহর যে অসীম শক্তিতে দিন রাত এসব মু'জিযা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর ক্ষমতায়ই মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর নাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মত মু'জিযাও সংঘটিত হতে পারে?

২৮. উপরে উল্লেখিত প্রশ্ন এ সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যে, তোমরা তো আল্লাহ তা'আলার গড়া। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছো। এখন এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তাহচ্ছে যে রিযিকে তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছো তাও আল্লাহই সৃষ্টি করে থাকেন। তোমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রচেষ্টা এর অধিক আর কিছুই নয় যে, তোমাদের পিতা তোমাদের মায়ের দেহাভ্যন্তরে এক ফোঁটা শুক্র নিক্ষেপ করে। অনুরূপ তোমাদের রিযিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রচেষ্টা জমিতে বীজ বপনের বেশী আর কিছুই নয়। যে জমিতে এই চাষাবাদ করা হয় তাও তোমাদের তৈরী নয়। এই জমিতে উর্বরা শক্তি তোমরা দান কর নাই। ভূমির যে উপাদান দ্বারা তোমাদের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা হয় তা তোমরা সরবরাহ কর নাই। তোমরা জমিতে যে বীজ বপন কর তাকে

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তোমরা কি চোখ মেলে কখনো দেখেছো, যে পানি তোমরা পান করো, মেঘ থেকে তা তোমরা বর্ষণ করো, না তার বর্ষণকারী আমি?[২৯] *আমি চাইলে তা লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি।*[৩০] *তা সত্ত্বেও তোমরা শোকরগোজার হও না কেন?*[৩১]

তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছো,—এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও তার গাছ[৩২] *তোমরা সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি? আমি সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ*[৩৩] *এবং মুখাপেক্ষীদের*[৩৪] *জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি।*

অতএব হে নবী, তোমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো।[৩৫]

প্রবৃদ্ধির উপযুক্ত তোমরা বানাও নাই। ঐ গুলো যে গাছের বীজ তার প্রতিটি থেকে ঐ একই প্রজাতির গাছ ফুটে বের হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট তোমরা সৃষ্টি কর নাই। সেই ভূমিকে বাতাসে ঢেউ খেলা শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য ভূমির অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং ভূমির উপরিভাগে যে বাতাস, পানি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও মৌসূমী পরিবেশ প্রয়োজন তার কোনটিই তোমাদের কোন তদবীর বা ব্যবস্থাপনার ফল নয়। এর সব কিছুই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপালক হওয়ার বিস্ময়কর কীর্তি। অতএব তোমরা যখন তার সৃষ্টি করার করণে অস্তিত্ব লাভ করেছো এবং তাঁরই দেয়া রিযিকে প্রতিপালিত হচ্ছো তখন তাঁর নির্দেশের বাইরে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করার অধিকার তোমরা কি করে লাভ করো?

এ আয়াতের যুক্তি প্রমাণ বাহ্যিকভাবে তাওহীদের স্বপক্ষে। তবে এতে যে বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে কেউ আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলেই এর মধ্যে আখেরাতের প্রমাণও পেয়ে যাবে। জমিতে যে বীজ বপন করা হয় তা মৃত বস্তু ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু কৃষক তাকে মাটির কবরে দাফন করার পর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি করেন। তা থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এবং সবুজ-শ্যামল শষ্য ক্ষেত্রের

মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার মৃত এভাবে কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠছে। এটা কি কোন অংশে কম বিস্ময়কর মু'জিযা যে, মানুষের মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে যে খবর দিচ্ছে সে মু'জিযাকে অসম্ভব মনে করবো?

২৯. অর্থাৎ শুধু তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাই নয় তোমাদের পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরা কর নাই। আমিই তা সরবরাহ করে থাকি। পৃথিবীর সমুদ্রসমূহ আমি সৃষ্টি করেছি। আমারই সৃষ্টি করা সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। আমি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট দিয়েছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। আমার সৃষ্ট বাতাস তা বহন করে নিয়ে যায়। আমার অসীম ক্ষমতা ও কৌশলে বাষ্পরাশি একত্রিত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আমার নির্দেশে এই মেঘরাশি একটি বিশেষ অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যাতে পৃথিবীর যে অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ পানি বরাদ্দ করা হয়েছে তা সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর আমি উর্ধাকাশে এমন এক মাত্রার ঠাণ্ডা সৃষ্টি করে রেখেছি যার ফলে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয়। আমি তোমাদেরকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নাই। তোমাদের প্রতিপালনের এত সব ব্যবস্থাও আমি করছি যা না থাকলে তোমরা বেঁচেই থাকতে পারতে না। আমি সৃষ্টি করার ফলে অস্তিত্বলাভ করে, আমার দেয়া রিযিক খেয়ে এবং আমার দেয়া পানি পান করে আমার মোকাবিলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবে কিংবা আমার ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে এ অধিকার তোমরা কোথা থেকে লাভ করেছো?

৩০. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও কর্মকৌশলের এক অতি বিস্ময়কর দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পানির মধ্যে যে সব অতি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট রেখেছেন তার একটি হচ্ছে, পানির মধ্যে যত বস্তুই মিশে থাকুক না কেন, তাপের প্রভাবে যখন তা বাষ্পে পরিণত তখন সমস্ত মিশে যাওয়া বস্তু নীচে পড়ে থাকে এবং শুধু জলীয় অংশই বাতাসে উড়ে যায়। পানির যদি এই বিশেষত্ব না থাকতো তাহলে পানি অবস্থায় তার মধ্যে মিশে থাকা বস্তুসমূহ বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ও তার মধ্যে থেকে যেতো। সুতরাং এমতাবস্থায় সমুদ্র থেকে যে বাষ্প উত্থিত হতো তার মধ্যে সমুদ্রের লবণও মিশে থাকতো এবং ঐ পানি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠকে লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত করতো। সে পানি পান করে মানুষ যেমন বেঁচে থাকতে পারতো না, তেমনি তা দ্বারা কোন প্রকারের উদ্ভিদও উৎপন্ন হতে পারতো না। এখন যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে কিছুমাত্র মগজ আছে সে কি এ দাবী করতে পারে যে, অন্ধ ও বধির প্রকৃতিতে আপনা থেকেই পানির মধ্যে এ জ্ঞানগর্ভ বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে? পানির যে বৈশিষ্টের কারণে লবণাক্ত সমুদ্র থেকে পরিষ্কার সুপেয় পানি উত্থিত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় এবং নদী, খাল, ঝর্ণা ও কূপের আকারে পানি সরবরাহ ও সেচের কাজ আঞ্জাম দেয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝে শুনেই তা করেছেন যেন পানি তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতিপালনের সহায়ক হয়। যেসব জীবজন্তুর পক্ষে লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপন করা সম্ভব তাদেরকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ু মন্ডলের বসবাসের জন্য

যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্য সুপেয় মিঠা পানির প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশে বৃষ্টির ব্যবস্থা করার পূর্বে তিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট দিলেন যে, তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তা যেন পানিতে মিশ্রিত কোন জিনিস সাথে নিয়ে উত্থিত না হয়।

৩১. অন্য কথায় তোমাদের মধ্যে কেউ এ বৃষ্টিকে দেবতাদের কীর্তি বলে মনে করে। আবার কেউ মনে করে, সমুদ্রের পানি থেকে মেঘমালার সৃষ্টি এবং পুনরায় তা পানি হয়ে আসমান থেকে বর্ষিত হওয়াটা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলছে। আবার কেউ এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করলেও আল্লাহর সামনেই আনুগত্যের মাথা নোয়াতে হবে এতটা অধিকার আল্লাহর আছে বলে মনে করে না। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের এত বড় না–শুকরী কেন করছো? আল্লাহর এত বড় নিয়ামত কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছো এবং তার বিনিময়ে কুফর, শিরক, পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছো।

৩২. গাছ বলতে যেসব গাছ থেকে জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হয় সে গাছের কথা বলা হয়েছে কিংবা মারখ ও আফার নামে পরিচিত গাছের কথা বলা হয়েছে যার তাজা কাঁচা ডাল পরস্পর রগড়িয়ে প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা আগুন জ্বালাতো।

৩৩. আগুনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ বানানোর অর্থ হচ্ছে, আগুন এমন জিনিস যা প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে মানুষকে তার ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগুন যদি না থাকতো তাহলে মানুষের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন হতো না। মানুষ পশুর মতো কাঁচা খাদ্য খাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে তা রান্না করে খাওয়া শুরু করেছে এবং আগুনের কারণেই মানুষের জন্য একের পর এক শিল্প ও আবিষ্কারের নতুন নতুন দরজা উদঘাটিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট, যেসব উপকরণের সাহায্যে আগুন জ্বালানো যায় আল্লাহ যদি তা সৃষ্টি না করতেন এবং আগুনে যে সব বস্তু জ্বলে তাও যদি তিনি সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষের উদ্ভাবনী যোগ্যতার তালা কোন দিনই খুলতো না। কিন্তু মানুষের স্রষ্টা যে একজন বিজ্ঞ পালনকর্তা যিনি একদিকে তাকে মানবিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যদিকে পৃথিবীতে সেসব উপকরণ ও সাজ–সরঞ্জামও সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে তার এসব যোগ্যতা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে সে কথা মানুষ একদম ভুলে বসে আছে। মানুষ যদি গাফিলতি ও অমনযোগিতায় নিমগ্ন না হয় তাহলে সে দুনিয়াতে যা যা ভোগ করছে তা কার অনুগ্রহ ও নিয়ামত সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এক আগুনই যথেষ্ট।

৩৪. মূল আয়াতে مقوين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মরুভূমিতে উপনীত মুসাফির বা পথচারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষ। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে সেসব মানুষ যারা খাবার পাকানো, আলো পাওয়া কিংবা তাপ গ্রহণ করার কাজে আগুন ব্যবহার করে।

৩৫. অর্থাৎ সে পবিত্র নাম নিয়ে ঘোষণা করে দাও যে, কাফের ও মুশরিকরা যেসব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা তাঁর ওপর আরোপ করে তা থেকে এবং কুফর ও শিরকমূলক সমস্ত আকীদা ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতিটি যুক্তি তর্কে যা প্রচ্ছন্ন আছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ'

অতএব না,[৩৬] আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের। এটা এক অতি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পার। এ তো মহা সম্মানিত কুরআন।[৩৭] একখানা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।[৩৮] পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[৩৯] এটা বিশ্ব–জাহানের রবের নাযিলকৃত। এরপরও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করছো?[৪০] এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ রেখেছো এই যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো?[৪১]

৩৬. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لَا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিলো। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যই এ কসম খাওয়া হচ্ছে।

৩৭. তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থান স্থল' অর্থ তাদের স্থান, তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। আর কুরআনের মহা সম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যত সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। যে আল্লাহ ঐ ব্যবস্থা তৈরী করেছেন সে আল্লাহ এই বাণীও নাযিল করেছেন। মহাবিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxies) ঐ সব ছায়াপথের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন নক্ষত্র (Stars) এবং গ্রহরাজি (Planets) বাহ্যত ছড়ানো ছিটানো দেখা গেলেও তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সুসংবদ্ধতা বিরাজমান এ মহাগ্রন্থও ঠিক অনুরূপ পূর্ণ মাত্রার সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন বিধান পেশ করে। যার মধ্যে আকিদা–বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত, তাহযীব তামাদ্দুন, অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি মোট কথা মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এর কোন একটি দিকই আরেকটি দিকের সাথে সামঞ্জস্যহীন ও বেখাপ্পা নয়। অথচ এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাষণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া উর্ধজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম–শৃঙ্খলা যেমন অপরিবর্তনীয়, তাতে কোন সময় সামান্য পরিমাণ পার্থক্যও সূচিত হয় না, ঠিক তেমনি এই গ্রন্থে যেসব সত্য ও পথ নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে তাও অটল ও অপরিবর্তনীয় তার একটি বিন্দুকেও স্ব–স্থান থেকে বিচ্যুত করা যেতে পারে না।

৩৮. এর অর্থ 'লাওহে মাহফুজ'। এটি বুঝাতে كِتَابٍ مَّكْنُونٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুরক্ষিত ঐ লিপিতে কুরআন মজীদ লিখিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা সেই ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যাতে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। কারণ, তা যে কোন সৃষ্টির ধরা ছোঁয়ার উর্ধে।

৩৯. কাফেররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আরোপ করতো এটা তার জবাব। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ সূরা শূ'আরাতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ –

"শয়তান এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তার জন্য সাজেও না। আর সে এটা করতেও পারে না। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাকে দূরে রাখা হয়েছে।"

(আয়াত ২১০ থেকে ২১২)

এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।" অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক এ বাণী নিয়ে আসা কিংবা নাযিল হওয়ার সময় এতে কর্তৃত্ব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যে সময় 'লাওহে মাহফুজ' থেকে তা নবীর (সা) ওপর নাযিল করা হয় সে সময় পবিত্র সত্তাসমূহ অর্থাৎ পবিত্র ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন।

আনাস (রা) ইবনে মালেক, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলীয়া, সুদ্দী, দাহ্হাক এবং ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। বাক্য বিন্যাসের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, বাক্যের ধারাবাহিকতা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত ধ্যান–ধারণার প্রতিবাদ করার পর কুরআন মজীদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তারকা ও গ্রহরাজির "অবস্থান ক্ষেত্র"সমূহের শপথ করে বলা হচ্ছে, এটি একটি অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর সুরক্ষিত লিপিতে তা লিপিবদ্ধ আছে কোন সৃষ্টির পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা এমন পদ্ধতিতে নবীর ওপর নাযিল হয় যে, পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শও করতে পারে না।

মুফাস্‌সিরদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لا শব্দটিকে 'না' অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন "পাক পবিত্র নয় এমন কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।" "কিংবা এমন কোন ব্যক্তির তা স্পর্শ করা উচিত—নয়, যে না পাক।" আরো

কতিপয় মুফাসসির যদিও لاَ শব্দটিকে 'না' অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ করেছেন এই গ্রন্থ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'না' শব্দটি ঠিক তেমনি নির্দেশ সূচক যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُه (মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না) এর মধ্যে উল্লেখিত 'না' শব্দটি নির্দেশসূচক। এখানে যদিও বর্ণনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মুসলমান যেন মুসলমানের ওপর জুলুম না করে। অনুরূপ এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, পবিত্র লোক ছাড়া কুরআনকে কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তা থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।

তবে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে খাপ খায় না। পূর্বাপর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ বাক্যের এরূপ অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু যে বর্ণনাধারার মধ্যে কথাটি বলা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে রেখে একে বিচার করলে এ কথা বলার আর কোন সুযোগই থাকে না যে, "পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ যেন এ গ্রন্থ স্পর্শ না করে।" কারণ, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে। তাদের বলা হচ্ছে, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, শয়তানরা নবীকে তা শিখিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়া এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবে না শরীয়াতের এই নির্দেশটি এখানে বর্ণনা করার কি যুক্তি ও অবকাশ থাকতে পারে? বড় জোর যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যদিও আয়াতটি নাযিল হয়নি। কিন্তু বাক্যের ভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দরবারে যেমন কেবল পবিত্র সত্তারাই এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে অনুরূপ দুনিয়াতেও অন্তত সেসব ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় এ গ্রন্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুক। যারা এ গ্রন্থের আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ইমাম মালেক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম বর্ণিত এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের নেতৃবৃন্দের কাছে আমর ইবনে হাযমের মাধ্যমে যে লিখিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল যে, لاَ يَمَسّ الْقُرْاٰنَ الاطاهر (পাক-পবিত্র লোক ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে)। আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে ইমাম যুহরী থেকে একথাটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লিখিত যে নির্দেশনামা দেখেছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল।

দুই ঃ হযরত আলী থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القران شيئ ليس الجنابة -

"অপবিত্র অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারতো না" (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি)।

তিন ঃ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القران

"ঋতুবতী নারী ও নাপাক কোন ব্যক্তি যেন কুরআনের কোন অংশ না পড়ে"।
(অবু দাউদ, তিরমিযী)

চার ঃ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিও লিখিত ছিল ঃ

يَآ اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ....

সাহাবা কিরাম (রা) ও তাবেয়ীনদের থেকে এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে যেসব মতামত বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত সালমান ফারসী (রা) অযু ছাড়া কুরআন শরীফ পড়া দুষণীয় মনে করতেন না। তবে তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। হযরত সা'দ (রা) ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও এমত অনুসরণ করতেন। হযরত হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীও বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরূহ মনে করতেন। (আহকামুল কুরআন– জাস্‌সাস)। আতা, তাউস, শা'বী এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আল–মুগনী–ইবনে কুদামাহ)। তবে তাঁদের সবার মতে অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া জায়েয।

নাপাক, হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া হযরত, 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইমাম যুহরীর মতে মাকরূহ। তবে ইবনে আব্বাসের (রা) মত ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের যে অংশ স্বভাবতই মুখে মুখে পড়তে অভ্যস্ত তা মুখস্ত পড়তে পারে। তিনি এ মতের ওপর আমলও করতেন। এ মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং সা'ঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ তার স্মৃতিতে কি কুরআন সংরক্ষিত নেই? সুতরাং পড়ায় কি দোষ হতে পারে? (আল–মুগনী ও আল–মুহাল্লা –ইবনে হাযম)।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আলাউদ্দীন আল–কাশানী بدائع الصنائع গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফীদের মতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ বিনা অযুতে নামায পড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি কুরআন মজীদ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে কুরআন মজীদ যদি গেলাফের মধ্যে থাকে তাহলে স্পর্শ করা যেতে পারে। কোন কোন ফকীহর মতে চামড়ার আবরণ এবং কারো

কারো মতে যে কোষ, লেফাফা বা জুযদানের মধ্যে কুরআন শরীফ রাখা হয় এবং তা থেকে আবার বের করা যায় তা–ই গেলাফের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ বিনা অযুতে তাফসীর গ্রন্থসমূহ এবং এমন কোন বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয় যার ওপর কুরআনের কোন আয়াত লিখিত আছে। কিন্তু ফিকাহর গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও উত্তম হচ্ছে বিনা অযুতে স্পর্শ না করা। কারণ দলীল প্রমাণ হিসেবে তার মধ্যে কুরআনের আয়াত লিখিত থাকে। হানাফী ফকীহদের কারো কারো মত হচ্ছে কুরআন মজীদের যে অংশে আয়াত লিখিত আছে শুধু সেই অংশ বিনা অযুতে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে অংশে টীকা লেখা হয় তা ফাঁকা হোক কিংবা ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু লেখা থাক, তা স্পর্শ করায় কোন দোষ নেই। তবে সঠিক কথা হলো, টীকা বা ব্যাখ্যাসমূহও কুরআনেরই একটা অংশ এবং তা স্পর্শ করা কুরআন মজীদ স্পর্শ করার শামিল। এরপর কুরআন শরীফ পড়া সম্পর্কে বলা যায় যে, "বিনা অযুতে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয।" ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থে শিশুদেরকে এই নির্দেশের আওতা বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছে। অযু থাক বা না থাক শিক্ষার জন্য শিশুদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়া যেতে পারে।

ইমাম নববী (র) المنهاج গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের মতামত বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ নামায ও তাওয়াফের মত বিনা অযুতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা কিংবা তার কোন পাতা স্পর্শ করা হারাম। অনুরূপ কুরআনের জিলদ স্পর্শ করাও নিষেধ। তাছাড়া কুরআন যদি কোন থলি বা ব্যাগের মধ্যে রাখা থাকে কিংবা গেলাফ বা বাক্সের মধ্যে থাকে বা দরসে কুরআনের জন্য তার কোন অংশ কোন ফলকের ওপরে লিখিত থাকে তাও স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে যদি কারো মালপত্রের মধ্যে রাখা থাকে, কিংবা তাফসীর গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ থাকে অথবা কোন মুদ্রার গায়ে তা ক্ষোদিত হয় তাহলে তা স্পর্শ করা জায়েয। শিশুর অযু না থাকলেও সে কুরআন স্পর্শ করতে পারে। কেউ যদি অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করে তাহলে কাঠ বা অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে পাতা উল্টাতে পারে।

'আল–ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের যে মত উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের সাথে তারা এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত কিন্তু কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনে তারা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। এমনকি তাদের মতে শিক্ষার জন্য ঋতুবতী নারীর জন্যেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয। ইবনে কুদামা আল–মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালেকের (র) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায় তো কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কারণ, আমরা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি তাহলে সে তা ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী মযহাবের যেসব বিধি–বিধান উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, নাপাক এবং হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন কিংবা কুরআনের পূর্ণ কোন আয়াত পড়া জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি পড়া জায়েয। কারণ এগুলো কুরআনের কোন না কোন আয়াতের অংশ হলেও সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য থাকে না। তবে কোন অবস্থায়ই বিনা অযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ (৮৩) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (৮৪) وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ (৮৫) فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (৮৬)
تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (৮৭) فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (৮৮)
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (৮৯) وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ
ٱلْيَمِينِ (৯০) فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ (৯১) وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ
ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ (৯২) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (৯৩) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (৯৪)
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (৯৫) فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (৯৬)

তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং নিজেদের এ ধারণার ব্যাপারে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে উপনীত হয় এবং তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাও যে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে সে সময় তোমরা বিদায়ী প্রাণবায়ুকে ফিরিয়ে আন না কেন? সে সময় তোমাদের চেয়ে আমিই তার অধিকতর নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। মৃত সেই ব্যক্তি যদি মুকাররাবীনদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম–আয়েশ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা জান্নাত। আর সে যদি ডান দিকের লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাদর অভিনন্দন জানানো হয় এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সে যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পনি এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা।

এ সবকিছুই অকাট্য সত্য। অতএব, হে নবী, আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ– তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[৪২]

জায়েয নয়। তবে চিঠিপত্রে কিংবা ফিকাহর কোন গ্রন্থ বা অন্য কিছু লিখিত বিষয়ের মধ্যে যদি কুরআনের কোন আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। অনুরূপভাবে কুরআন যদি কোন জিনিসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে তাহলে অযু ছাড়াই তা হাত দিয়ে ধরে উঠানো যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহ হাত দিয়ে ধরার ক্ষেত্রে অযু শর্ত নয়। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অযুহীন কোন লোককে যদি হাত দিয়ে কুরআন শরীফ

স্পর্শ করতে হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের এ মাসয়ালাটিও উল্লেখ আছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যেও শিশুদের বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ঠিক নয়। তাদের হাতে কুরআন শরীক দেয়ার আগে তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য তাদের অযু করানো।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে জাহেরীদের মাতামত হচ্ছে, কেউ বিনা অযুতে থাক বা নাপাক অবস্থায় থাক কিংবা ঋতুবতী স্ত্রীলোক হোক সবার জন্য কুরআন পাঠ করা এবং হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয। ইবনে হাযম তাঁর আল–মুহাল্লা গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৭৭ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা) এ মাসয়ালা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাতে এ মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন পাঠ করা এবং তা স্পর্শ করার ব্যাপারে ফকীহগণ যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন তার কোনটিই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়।

৪০. মূল আয়াতের কথাটি হচ্ছে أَنتُم مُّدْهِنُونَ । ادهان অর্থ কোন ব্যাপারে খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করা। ইংরেজীতে (to take lightly) কথাটি দ্বারা প্রায় একই অর্থ প্রকাশ পায়।

৪১. ইমাম রাযী تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ কথাটির ব্যাখ্যায় এখানে রিযিক শব্দটির অর্থ আয় রোজগার ও উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করেছেন। কুরাইশ গোত্রের কাফেররা যেহেতু কুরআনের দাওয়াতকে তাদের উপার্জন ও আর্থিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করতো। তারা মনে করতো এ আন্দোলন যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহলে আমাদের আয় উপার্জনের পথ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা পেটের ধান্ধার কারণেই কুরআনকে অস্বীকার করে যাচ্ছো। তোমাদের কাছে হক ও বাতিলের কোন গুরুত্বই নেই। তোমাদের দৃষ্টিতে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে রুটি। রুটির জন্য তোমরা হকের বিরোধীতা করতে এবং বাতিলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধান্বিত নও।

৪২. হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে রুকূ'তে স্থান দাও। অর্থাৎ রুকূ'তে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়। পরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতটি নাযিল হলে তিনি বললেন, এটিকে তোমরা সিজদায় স্থান দাও। অর্থাৎ সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড় (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাববান, হাকেম)। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে নিয়ম পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছেন তার ছোট ছোট বিষয়গুলো পর্যন্ত কুরআনের ইংগিত ও নির্দেশনা থেকেই গৃহীত।